লন্ডন আই

পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পৃথিবীর বড় বড় শহরে নানা বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হয়। আমাদের দেশের নাগরদোলারই একটি আধুনিক সংস্করণ লন্ডন আই। যে নাগরদোলা চড়ে দেখা যায় পুরো লন্ডন শহর। সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়েই এ সংখ্যা ভ্রমণ কাহিনীর মতো একটি রম্য রচনা

আধুনিক নাগরদোলা

লিখেছেন **ফরিদুর রেজা সাগর**

ইংল্যান্ডে বেড়াতে যাবার কথা শুনলে প্রথমেই মনে হয়, মাদাম ত্যুসো মিউজিয়ামের কথা। বেকার স্ট্রিট টিউব স্টেশনে টিউব থেকে নেমে উপরে উঠলেই চোখে পড়বে সারি সারি দোতলা বাস। লেখা- দি বিগেস্ট ট্যুর। ভিনটেজ ট্যুর। দি বিগ বাস কোম্পানি ট্যুর। হলুদ আর লাল রঙের এই বাসগুলোতে একবার টিকেট কেটে চড়লে পুরো লন্ডন শহরটা ঘুরে দেখা তো যায়ই, উপরন্তু সারাদিন যতবার খুশি, এই বাসগুলোতে ওঠানামা করা যায়। রাস্তার পাশে প্রতি স্টপেজে যে বাস কন্ডাকটর দাঁড়িয়ে থাকে- নগদ পাউন্ডে তো বটেই, ক্রেডিট কার্ডেও টিকেট করা যায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। শুধু

এটুকুই নয়, এই বাসে টিকেট কাটলে থাকে আরও কিছু আকর্ষণীয় অফার। যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দোকানের ডিসকাউন্টের কুপন। নাটক দেখার ডিসকাউন্টে টিকেট। তারপরে মাদাম ত্যুসো কিংবা অন্য দেখার মতো জায়গায় লম্বা কিউতে না দাঁড়িয়ে সহজ প্রবেশাধিকার। বেকার স্ট্রিটের টিউব স্টেশন থেকে ওপরে উঠে বামদিকে যেমন রয়েছে মাদাম ত্যুসোর বিখ্যাত মিউজিয়াম তেমন কেউ যদি ডান দিকে যান তাহলে কিন্তু পাবেন গোয়েন্দা শার্লক হোমসের সেই বিখ্যাত বাড়ি। এটা অনেকেই জানেন না, তবে মাদাম ত্যুসোর চেয়ে এই বাড়িটিও দেখার জন্য যথেষ্ট আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান দর্শকদের কাছে। মাদাম ত্যুসো যেমন লন্ডনের একটা ল্যান্ডমার্ক হিসেবে পরিচিত শালিক হোমসের বাড়িটা হয়তো

ততোটা নয়। তবে এক বয়সী মানুষের কাছে শার্লক হোমসের বাড়িটা জাগিয়ে তুলতে পারে অনেক নস্টালজিক স্মৃতি। ইদানীং কালে লন্ডনে ল্যান্ডমার্ক হিসেবে খুব বেশি চিহ্নিত হচ্ছে দুটো নতুন জায়গা। মিলেনিয়াম ডোম এবং লন্ডন আই।

'লন্ডন আই' এই শব্দটা শুনলেই অনেককিছু মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কেউ যদি টেমস নদীর পাড়ে এই লন্ডন আই দেখেন তাহলে সেটি আমাদের দেশে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন মেলায় দেখা নাগরদোলার আধুনিক সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়। নাগরদোলাকে অনেকে প্রচলিত বাংলায় রাধাচূড়াও বলে। প্রাচীন এই জিনিসটিকে কতখানি আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে করে তোলা যায়- লন্ডনের মতো এই শহরে ল্যান্ডমার্ক হিসেবে যেটা চিহ্নিত হতে পারে। যেটা দূর থেকে দেখা নাগরদোলাকে কাছে এসে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

জাহাজে করে কেউ ইচ্ছে করলে টেমস নদীতে লন্ডন ব্রিজ- যে ব্রিজে- একটু আগে চলছিলো গাড়ি, বাস। সে ব্রিজটি দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আর বিশাল জাহাজ ব্রিজের এক পাশ থেকে আরেক পাশে অনায়াসে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে কিছুটা পায়ে হেঁটে 'লন্ডন আই'-এর কাছে পৌঁছালে শুধু দেখবেন তার জন্য কী বিশাল বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা করছে এই আধুনিক নাগরদোলা। নাগরদোলার পাশে রয়েছে বিশাল ওয়েটিং রুম, টিকেট কাউন্টার। খাবারের জায়গা। এই নাগরদোলার অফিসিয়াল নাম হলো- ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ লন্ডন আই। ফলে পরিবেশটা এমন হয়ে রয়েছে যে, আপনার মনে হবে আপনি কোনো প্লেনে চড়ে যাচ্ছে। টিকেট কাউন্টার, টিকেটের আদল সবকিছুই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে চড়ার মতোই। টিকেট নিয়ে কিউতে দাঁড়িয়ে চড়তে হয় লন্ডন আইতে। মাটি থেকে লন্ডন আইয়ের উচ্চতা একশ' পঁয়ত্রিশ মিটার। মোট ওজন একুশ'শ টন। ২৬ মাইল প্রতি সেকেন্ডে এর চলমান গতি। পুরোটা ঘুরে আসতে সময় নেয় ৩০ মিনিট। নাগরদোলার প্রতিটা ক্যাপসুলে ২৫ জন লোক উঠতে পারে। একদম ওপর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত লন্ডন শহরের অনেক কিছু দেখা যায়। যেটাকে বলা হয়- পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্যবেক্ষণ হুইল (অবজার্বেশন হুইল)। বাংলাদেশের নাগরদোলার আধুনিক সংস্করণটি তৈরি করেছেন দু'জন স্থপতি জুলিয়া বারফেট এবং ভেভিড মার্কস। সম্পর্কে এরা স্বামী-স্ত্রী।

কিউতে দাঁড়িয়ে 'লন্ডন আই'-এর একটি ক্যাপসুলে বসে পড়লে প্রথম মনে হবে কোথায় এলাম। একটু পরে বোঝা যাবে- ব্যাপারটা এমন ভীতিজনক কিছু নয়। আস্তে আস্তে ক্যাপসুলটি ওপরে যাচ্ছে। ক্যাপসুলটি বেশ বড়। যথেষ্ট জায়গা জুড়ে হাঁটাচলা করা যায়। বসারও পর্যাপ্ত জায়গা আছে। দাঁড়িয়ে তো থাকা যায়ই। ক্যাপসুলের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণ দিক লেখা রয়েছে। হাতে যদি কেউ কোনো ক্যাটালগ নিয়ে যায় তাহলে সহজেই মিলিয়ে দেখে বুঝতে পারবে— সেই মুহূর্তে লন্ডন

শহরের কোথায় কি দেখা যাচ্ছে। একদম ওপরে ওঠার পরে– শুধু যে টেমস নদীর চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নয়, বিগব্যাংক, রয়েল অপেরা হাউস, মিলেনিয়াম ব্রিজ, টাওয়ার অব লন্ডন, মিলেনিয়াম ডোম, ওভাল ক্রিকেট মাঠ, পার্লামেন্ট অফিস, বাকিংহাম প্যালেস- কোনো কিছুই আপনার দৃষ্টির বাইরে থাকবে না। তারপর যখন ক্যাপসুলটি নিচের দিকে নামা শুরু করবে তখন মনে হয় অন্যরকম অনুভূতি। মনে হয় সত্যি সত্যি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কোনো ফ্লাইট আকাশ থেকে বুঝি ল্যান্ডিং করছে। নামার সময় আরও একবার লন্ডন শহরকে ভালোমতো দেখে নেয় দর্শকরা। একই সঙ্গে শুরু হয়, ক্যামেরা শাটারের ক্লিক ক্লিক শব্দ। যে যার মতো ছবি তুলতে থাকেন। কিন্তু নামার পর যখন হেঁটে বের হতে হয়, তখন বিস্মিত হয়ে দেখতে হয়, একটি জায়গায় আপনার ওপরে থাকার সময় বিস্মিত মুখের ভঙ্গি নিয়ে আপনার ফটোগ্রাফটি

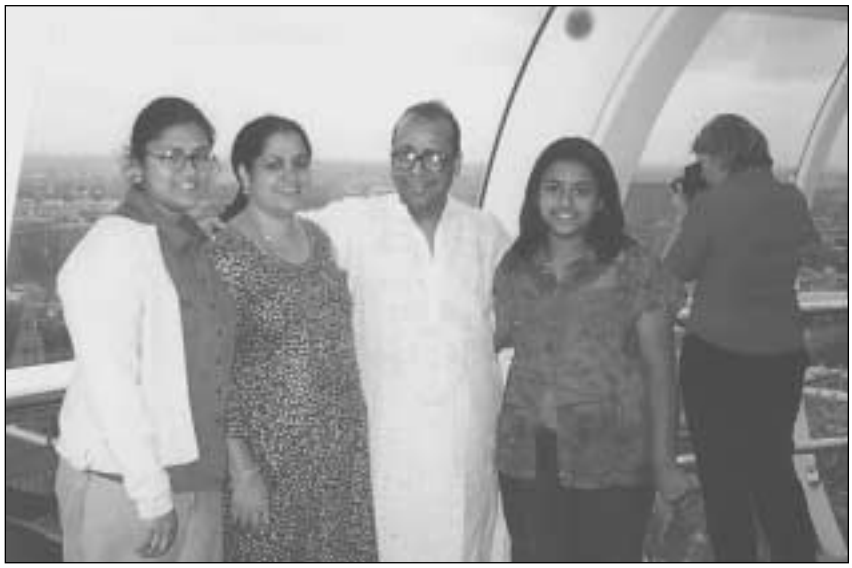

লন্ডন আইতে দোলনার ভেতরে সপরিবারে ফরিদুর রেজা সাগর

রয়েছে সামনে। কখন যে ছবিটি কম্পিউটারে গৃহীত হয়েছে তা আপনারও জানা নেই। ফলে নিজের বিস্মিত মুখের ভঙ্গি দেখে অবাক হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। ইচ্ছে করলে আপনিও ছবিটি কিনতে পারেন। তবে ক্যাপসুলের ভেতরে যখন ছবি তোলা হয় তখন দিনের বেলা ফ্ল্যাশ ব্যবহার না করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। একই সঙ্গে মাইক্রোফোনেও চলতে থাকে নানা রকম ধারাবর্ণনা।

এখন যারা লন্ডনে বেড়াতে যান তাদের কাছে লন্ডন আই একটা নতুন কিছু দেখার জায়গা। লন্ডন আই এখন ইংল্যান্ডের অন্যতম ল্যান্ডমার্ক। এটা তৈরি করে দু'জন স্থপতি তাদের নাম, তাদের সাফল্যের তালিকায় বড় একটি সংযোজন ঘটিয়েছেন।

আমাদের সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নাগরদোলা। আম আঁটির ভেঁপু বাজিয়ে যে ছেলেটি চট করে চড়ে বসে দোলনায়, কিংবা বাংলাদেশের ঐতিহ্য বোঝাতে আমরা কখনও ব্যবহার করি নাগরদোলার একটি ছবি- সেই নাগরদোলারই আধুনিক একটি সংস্করণ পরিচিত হয়েছে সর্বাধুনিক শহরের প্রতীক চিহ্নে। এমন কী প্যারিসের সাঁসলিজেঁর শেষ মাথায় একটি বিরাট যান্ত্রিক নাগরদোলা রয়েছে যা লন্ডন আইয়ের মতো অতো বিরাট না হলেও প্রতি রাতে সাঁসলিজেঁর রাস্তায় দেশ বিদেশের পর্যটকরা কী আগ্রহ নিয়ে সেই আলোক সজ্জিত রাধাচূড়ায় চাপেন- তা যারা প্যারিসে গেছেন তারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন। জানি না- আমাদের দেশের নাগরদোলার মতো এইসব সাধারণ জিনিসের ওপর কবে কার চোখ পড়বে! তৈরি হবে 'লন্ডন আই'-এর মতো কোনোকিছু!